Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 137–141
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক অবস্থান

অচিন্ত্য কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : achintyad7@gmail.com

Keyword
জীবন, জীবিকা, পেশা, সমাজ, বৃত্তি, সংগ্রাম, শ্রেণী বৈষম্য, অভাব-অনটন।

Abstract
আলোচ্য নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের তিন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কীভাবে নিজের জীবিকা র্নিবাহ করছে সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজে উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত অবস্থিত সকল মানুষের জীবন কীভাবে তাদের নিজেদের জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার প্রমাণ আলোচ্য চার উপন্যাসের পরতে পরতে লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনের যে বৃত্ত তা তার বৃত্তির পরিধিতেই আবদ্ধ, সেই পরিধি অতিক্রম করে তারা যেতে পারে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সংলাপ ইত্যাদি বিষয়গুলি অনেকটা নির্ভর করে থাকে সমাজে অবস্থিত মানুষের জীবিকাকে কেন্দ্র করে। সমাজে বসবাসকারী তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা অনেক বেশি। কারণ তারা যে জীবিকাকে বেছে নেয় তাতে তাদের উপার্জন হয় অল্প। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হলে মানুষের মনের মধ্যে ক্ষুদ্রতা বাসা বাঁধবেই। মানুষ আগে পেটে ভাত চায়, তার পরে ধর্মের কথা শুনতে চায়। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ আমরা দেখতে পাই বুধনি নিজের খাওয়া-পরার স্থায়ী আস্থানা খুঁজতে গিয়ে একমাত্র কোলের সন্তানকে ফেলে রেখে পুনঃবিবাহ করে নেয়। আবার মানুষ নতুন করে বাঁচতে গিয়ে নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের চরিত্রকে দেখা যায় এই ভূমিকায়। কর্তব্য অনেক সময় মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে এক বৃত্তি থেকে অন্য বৃত্তিতে 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে হরিহরকে আমরা দেখি কেমন করে সে একের পর এক পেশা বদল করে চলে শুধু সংসার চালানোর জন্য। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এক দিকে শশীর জীবিকা শুধু তার জীবনকে স্থির করে ফেলেছে তা নয় অনেকটাই স্থবির করে তুলেছে। অন্য দিকে কুমুদ নিত্য নতুন পেশাতে নেশাগ্রস্থ হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রাতিক শক্তি বারবার কাজ করেছে তার জীবনে।

Discussion

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ বিশেষ, কারণ যখন কোনো লেখক কোনো কাহিনি রচনা করেন তখন তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ব্যক্তি জীবনকে আশ্রয় করেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সমাজে বসবাস ও জীবনধারণের জন্য তাকে কোনো না কোনো পেশার উপর নির্ভর করতেই হয়। আর এই কারণে যখন কোনো সমাজকেন্দ্রিক সাহিত্য আমাদের সামনে আসে, সেখানে ওই সমাজে অবস্থিত মানুষগুলির রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এই সবের সঙ্গে মানুষগুলির জীবিকার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল ভাবে। এই জীবিকা বা পেশা কেবল মাত্র দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটায় না, জীবিকার মধ্য দিয়ে একটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক জীবনেরও বিকাশ ঘটে থাকে। আর জীবিকার মধ্য দিয়েই কোনো মানুষ বা বৃহত্তর অর্থে সমাজের অর্থনৈতিক দিকটিকেও বিচার বিশ্লেষণ করা যায়। এই নিবন্ধে তিন জন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকের নির্বাচিত উপন্যাসের সাপেক্ষে বিষয়টি উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি—

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' : সতীনাথ ভাদুড়ী

সাধারণ মানুষ দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য নানা রকম কাজ করে থাকে। জীবনে শুধু অন্ন-বস্ত্র–বাসস্থানের জন্য মানুষ খোঁজে কিছু স্থায়ী উপার্জনের পন্থা। মনের গতির সঙ্গে যদি তার জীবিকা একাত্ব হয়ে থাকে তাহলে সে কাজ হয় আনন্দদায়ক। কিন্তু জীবনের বন্ধুর পথে চলতে গিয়ে মানুষ বাধ্য হয়ে এমন কাজে লিপ্ত হয় যার সঙ্গে তার মনের কোন সংযোগ থাকে না। রামচরিত মানসের অনুকরণে ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করেন– 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। রামায়ণের রাম চরিত্রের মতো আমরা এই উপন্যাসে ঢোঁড়াই চরিত্রের বিবর্তনশীলতা যেমন লক্ষ করে থাকি, তেমনই তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাগুলির সঙ্গে অবহিত হয়ে থাকি। রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে যেমন বিভিন্ন কাহিনির পরিচয় পেয়ে থাকি তেমনি এই রচনাতে আমরা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন কাণ্ডে বর্ণিত হতে দেখি। লেখক বিহারের এক বিশেষ অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনকে তুলে ধরেছেন। কাহিনির মূল কেন্দ্র হাভেলি পরগণার অন্তর্গত তাৎমাটোলা। এই টোলার লোকেদের জীবন সম্পর্কে ধারণা খুবই সরল ও স্পষ্ট। তারা বলে—

> "রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন।"[১]

এই গ্রামের লোকেরা বিপদে-আপদে, অসুখে-বিসুখে পরিত্রাণের জন্য রোজার কাছে ছুটে যায়। জীবিকা অর্জনের জন্য তারা বেছে নিয়েছে ঘরামি এবং কুঁয়োর বালি তোলার মতো কাজ। ধর্মের দিক থেকে এরা রামায়ণকে বিশেষ ভাবে মান্য করে। তাই রামায়ণের বুলি প্রত্যেক পুরুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়, বিশেষ করে গ্রামের মোড়লদের। এদের সমাজে প্রত্যেক সমস্যার মীমাংসা হতো এই পঞ্চায়েতিতে। বিয়ের সময় কন্যা পক্ষকে পণ দেওয়ার রীতি ছিল। সমাজে নারীরা ছিল অনেকটাই স্বাধীন। বিধবা নারীরাও পুনরায় বিয়ে করতে পারতো সমাজের অনুমতি নিয়ে। ঢোঁড়াই-এর মা বুধনীও বৈধব্যের পরে পুনঃবিবাহ করে বাবুলালকে। বৈধব্যকালে বুধনী বর্ষাকালে বকরহটটার মাঠ থেকে ঘাস কেটে টৌনে বিক্রি করে, অঘ্রান মাসে ধান কেটে, মাঘ মাসে বুনোকুল, ফাল্গুন চৈত্র মাসে শিমূল তুলো আর কচি আম বিক্রি করে পেট চালায়। কার্তিক অঘ্রান মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তাই তাৎমা মেয়েরা ধান কাটতে যায়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঢোঁড়াইকে দেখলে আমরা বুঝতে পারব মানুষ কী করে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাৎমাটোলার মানুষ জীবন ধারণ করে থাকে। ছোট বেলায় ঢোঁড়াই বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষা করে। ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানজনক নয় তাই সে ভিক্ষা ছেড়ে ধাঙড়দের সঙ্গে রাস্তা তৈরির কাজ করতে যায়। রামিয়ার সঙ্গে বিয়ের পরে ঢোঁড়াই গোরুর গাড়ি করে মাল চালানের কাজ করে। শেষে ঢোঁড়াই তাৎমাটোলা ছেড়ে বিসকন্ধা গ্রামে গিয়ে কৃষি কাজে নিযুক্ত হয়ে যায়। জীবন ধারণের জন্য জীবিকার যে একান্ত প্রয়োজন তা আমরা বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পারি। এ ছাড়াও জীবিকার মধ্য দিয়ে মানসিকতারও যে পরিবর্তন হয় তাও দেখতে পাই। ভিক্ষাবৃত্তির থেকে মাটি কাটা সম্মানের কাজ। আবার গোরুর গাড়ি করে মাল নিয়ে যাওয়ার কাজে নানা লোকের, নানা গ্রামের, নানা রকমের মানুষের সঙ্গে আলাপ

হয়ে ঢোঁড়াই জগতকে জানতে বুঝতে শিখেছে। কৃষিকাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে ঢোঁড়াইয়ের ভাবধারা অন্যান্য তাৎমাদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গেছে।

'পদ্মা নদীর মাঝি' : মানিক বন্দোপাধ্যায়

তটিনীর তীরের সঙ্গে মনুষ্যের নীড়ের সম্পর্ক সুপ্রাচীন কাল থেকে। সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তেমনি ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস ও নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নানা প্রাচীন সভ্যতা। মানুষ যতই উন্নত হয়েছে ততই সে নদীকে কাজে লাগিয়েছে নানা ভাবে। জলের অপর নাম জীবন, এটা শুধু পানের জন্য বলা হয়; বৃহত্তর ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ নদী যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নদীমাতৃক বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস। এখানে আমরা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত কেতুপুর নামক ধীবর পল্লীর উল্লেখ পাই। পদ্মাতীরের এই জেলে মাঝিদের মাছ ধরা, মাছ তোলা ও পণ্যদ্রব্য রূপে বাজারে বিক্রি করা, তাদের জল-জীবন, নৌকো, জাল, মাছ ধরার কৌশল, গ্রাম্য জীবনযাত্রা কলহ-বিবাদ, জন্ম-মৃত্যু, উৎসব-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। উপন্যাসের প্রথমে লেখক তাঁর নায়ককে দেখিয়েছেন নিশ্চেষ্ট, অসহায়, অদৃষ্টের নির্জীব ক্রীড়নক রূপে, সহকর্মীর সঙ্গে দুআনা চারআনা ভাগে মজুরি খেটে যার জীবিকা চলে। বর্ষায় সারা রাত জেগে তারা ইলিশ মাছ ধরে নিজের শরীরের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে। কারণ বর্ষা শেষ হলেই বিপুলা পদ্মা তার মীন সন্তানদের নিজের অতল গভীরে লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু সারা রাত জেগে মাছ ধরেও তাদের আর্থিক কোনো উন্নতি হয়নি। যদি সকলেরই বেশি মাছ ওঠে তাহলে ভোরে দেবীগঞ্জ বাজারে মাছের দাম কমে যাবে। দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি এদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। অভাবের কারণেই হয়তো এদের মানসিকতা অনেকটা নিম্ন প্রকৃতির। উপন্যাসের নায়ক কুবেরও মাছ ধরে বর্ষায়, অন্য সময়ে মাঝিগিরি করে পদ্মাতে। কুবেরের মনে পদ্মা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাবনা আসে না। কুবের একদিন কপিলার বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কারণ—

> "পদ্মা নদীর কুল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তার। পদ্মার বাতাস গায়ে না লাগিলে, কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে সে সুস্থ হইবে না।"[২]

সেই কুবের কপিলার জন্য পদ্মাকে ছেড়ে, মাঝিগিরি ছেড়ে চলে যায় ময়না দ্বীপে। সেখানে গিয়ে কৃষি কাজ করতে হবে জেনেও কুবের চলে যায়। কপিলার সঙ্গে নতুন জীবন সূচনা করতে গিয়ে কুবের নতুন পেশা কৃষি কাজে নিযুক্ত হতেও দ্বিধা বোধ করেনি। জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুবের জীবন ধারণের জন্য নতুন জীবিকাকে স্বীকার করে নেয়।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুতুল একটি নির্জীব বস্তু যা দেখতে অবিকল মানুষের মতো। কিন্তু এই নির্জীব পুতুলকে মানুষ মনোরঞ্জনের একটি সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। পুতুলের নাচ দেখলে মনে হয় সেটা যেন একটি জীবন্ত দৃশ্য, কিন্তু এই দৃশ্যের নেপথ্যে থাকে অন্য এক ব্যক্তির অভিসন্ধি। এই সংসারে সম্পূর্ণ জীবজগৎ সেই পুতুলের মতোই। মানুষ ভাবে সে নিজে সমস্ত কাজ করছে কিন্তু তার পিছনে যে নিয়তির হাত আছে তা কেউ বুঝতে পারে না। বাস্তব জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে থাকে, সেই কার্যের সঙ্গে মনের এক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে বেশির ভাগ সময়। মানুষের এই মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা চিরন্তন। সেই দ্বন্দ্বলীলার মাঝে মানুষের বিবিধ বিচরণকেই ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে তুলে ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মধ্যে আমরা গাওদিয়া নামক ছোট একটি গ্রামের পরিচয় পাই। সেই গ্রামে শশী কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়ে আসে। এই শশী চরিত্রের স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে—

> "এক দিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নেই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও সম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট।"[৩]

শশীর এই ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ দিকটি গোপন ও মূক। সাধারণত শশীর বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবি দিকটার পরিচয় সকলে পেয়ে থাকে। ডাক্তার হিসাবে শশী রোগীর সেবা করতে কোনো ত্রুটি রাখে না। কলকাতা থেকে গ্রামে ডাক্তারি

করতে এসে তার ভালো লাগে না। ক্রমশ এই বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে ওঠে শশী। কলকাতার আদপ–কায়দার প্রয়োজনীয় অংশটুকু রেখে বাকিটা মন থেকে মুছে ফেলে সে। ডাক্তারের কাজ শুধু চিকিৎসা করা নয়, রোগীর সেবা করাও বলা যায়। শশীর মধ্যেও আমরা সে দিকটা দেখতে পাই– সেন-দির ও মতির চিকিৎসা করার সময়। এই ডাক্তারি করে সে নিজেও কিছু উপার্জন করে থাকে। তাই বাকি টাকা আদায়ের জন্য বাসুদেব বাঁড়ুজ্যেকে বলে–

> "বাবা বলছিলেন, কতবার তো বাঁড়ুজ্জে বাড়ি গেলি শশী, পয়সা কড়ি দিচ্ছে কিছু ? দুটো একটা কলের টাকা না দিলে তো বিপদে পড়ি কাকা।"[৪]

টাকার হিসেব করলেও শশীর মধ্যে মানবতাবোধ মুছে যায়নি, তাই বাসুদেব যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন শশী যে টাকাগুলির হিসাব দিয়েছিল তাতে ভুতোর চিকিৎসার কোনো টাকা ধরেনি; কারণ ভুতোকে সে বাঁচাতে পারেনি। শশীর কল্পনা জুড়ে রয়েছে বৃহৎ পৃথিবী, তাই সে বিদেশ যাত্রা করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শশীর আর বিদেশ যাত্রা হয় না। শশীকে এই গ্রামের মধ্যেই শশীডাক্তার হয়ে থেকে যেতে হয়। এখানে শশীর জীবিকা মনের বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে এক যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে আমরা কুমুদকে দেখতে পাই যে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করে থাকে, নিয়মের কোনো শৃঙ্খলা তার মধ্যে নেই। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে সে চাকরি নেয়। কিন্তু একদিন অন্তর অফিসে যাওয়ার জন্য চাকরিও চলে যায় তার। চাকরি যাওয়ার পরে কুমুদ বিনোদিনী অপেরাতে যাত্রা করতে আরম্ভ করে। যাত্রা দল ছেড়ে কিছু দিন থিয়েটার করে। আবার কখনো নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে ধার করে দিন কাটায়। জীবনকে উপভোগ করে জীবনধারণের নানা পন্থা বেছে নেয়। এক মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চায় সে কোনো কিছুর চিন্তা না করে।

'পথের পাঁচালি' : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচালিকার তাঁর পাঁচালি মধ্যে কোন এক ঘটনাকে দীর্ঘ ও বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকেন। পাঁচালির মধ্যে আমরা যেমন একটি দীর্ঘ কাহিনির বর্ণনা পেয়ে থাকি তেমনি সেখানে থাকে ছন্দের এক দোলা, যা আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটিও এক প্রকার পাঁচালি। এই উপন্যাসে লেখক এক ব্যক্তি জীবনের পথ চলার বর্ণনা দিয়েছেন বিশদভাবে। জীবনে চলার পথে মানুষ কতো কি যে করে থাকে তার এক জীবন্ত চিত্র ঔপন্যাসিক তাঁর কলম দিয়ে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক সব স্থানের বর্ণনা করলেও সেই বর্ণনা হল 'To the point' । তিনি ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছেন যতটুকু তাঁর প্রয়োজন বলে মনে হয়ে ছিল এই উপন্যাস রচনাতে। মানুষের এই জীবন সত্যি যেন এক পথ চলা, যে পথে কতো পথিকের সঙ্গে আলাপ হয় আবার তাদের ফেলে চলে যেতে হয়। উপন্যাসের মধ্যেও আমরা এই পথ চলার দিকটি লক্ষ করে থাকি। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হরিহর, সে নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের এক প্রধান।

> "হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধা ভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।"[৫]

যৌবনে হরিহর পশ্চিম দেশে অনেক দিন কাটিয়েছে নিশ্চিন্তে বাধাহীনভাবে। বিবাহের দশ বছর পরে হরিহর ছেলে-মেয়ের পিতা, এখন সে মধ্যবয়সী পুরোদস্তুর সংসারী। সংসার চালানোর জন্য এখন হরিহর অন্নদা রায়ের কাছে গোমস্তার কাজ করে আট টাকা মাইনেতে। এখন সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাজনা আদায় করে, পৈর্তৃক আমলের শিষ্যদের ঘর সন্ধান করে গুরুগিরি করে। এখন তার সঙ্গে আগেকার সেই অবাধ গতি, মুক্ত প্রাণ, ভবঘুরে হরিহরের কোনো মিল নেই। এখন হরিহর সম্পূর্ণ রূপে সাংসারিক নাগপাশে আবদ্ধ, এখান থেকে মুক্ত হওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন করে হোক সংসার তাকে চালাতেই হবে। হরিহরের আর্থিক অবস্থা যে ভালো নয় তার প্রমাণ ছেলের কমদামি খেলনা, পরনের ছেঁড়া ধুতি, ধার ও দেনার বহরে স্পষ্ট। হরিহর সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে চায় তাই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে গয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায় সেখানে থেকে কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে এক মহাজনের বাড়িতে নিত্য গৃহ দেবতার পূজা করতে চলে যায়। অভাবের কারণে হরিহরের কন্যা দুর্গা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। জীবনের দারিদ্র্যকে দূর করার জন্য হরিহর বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে নিশ্চিন্দিপুর থেকে বাস উঠিয়ে কাশী যাত্রা করে সপরিবারে। কাশীতে গিয়ে হরিহরের জীবনে আবার এক

নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কাশীতে এসে হরিহর কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ পাঠের কাজ যোগাড় করে এবং বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে পুরাণ পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে। এর পরে হরিহর ঘাটে কথকতা গাইতে থাকে। এভাবে চলে বেশ কিছু বছর। তারপর এমনি করে দিন কাটার মধ্যেই একদিন হরিহরের মৃত্যু হয়। হরিহরের মৃত্যুর পরে স্ত্রী সর্বজয়া এক ধনী পরিবারে রাঁধুনির কাজে নিযুক্ত হয়ে যায় শুধু দুবেলা দুটো অন্ন সংস্থানের জন্য। সমাজের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষ অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে শুধু মাত্র জীবনধারণের জন্য। সংসার চালানোর জন্য যৌবন বয়সের সেই উদ্দাম অবাধ হরিহর কখনো গুরুগিরি, কখনো গোমস্তার কাজ, কখনো পূজাপাঠ করে শেষে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে কাশী গিয়ে ঘাটে কথকতা গাইতেও দ্বিধা বোধ করেনি। সমাজে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ডও হয়ে থাকে মানুষের জীবিকা বা পেশা। যখন হরিহর নিশ্চিন্দিপুরে গুরু ব্রাহ্মণ, তখন সমাজ ও লোকের চোখে তুচ্ছ হয়ে যায়নি হরিহর ও সর্বজয়া দরিদ্র হওয়ার সত্ত্বেও। আর যখন সর্বজয়া রাঁধুনি তখন সে ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়েও একজন পরিচারিকা মাত্র।

কেবল মাত্র জীবনধারণের জন্যই মানুষকে নানা জীবিকার উপরে নির্ভর করে থাকতে হয়। প্রত্যেক বৃত্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে তেমনি সামাজিক মর্যাদাও নির্ধারিত হয় এই বৃত্তিকে কেন্দ্র করে। মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায় কখনো বা বাধ্য হয়ে কাজ করে থাকে শুধু মাত্র কিছু সুখ ও অন্ন সংস্থানের জন্য। তাই এ কথা বলা যেতেই পারে– জলের সঙ্গে জীবনের যেমন সম্পর্ক, তেমনি সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে জীবিকার।

আলোচ্য চারটি উপন্যাসে জীবন ও জীবিকার পারস্পরিক অন্বয়ের দিকটি যেমন স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান কিংবা মর্যাদা কীভাবে স্থিরিকৃত হয় এই এই সূত্রে তাও দেখিয়েছেন তিন লেখক।

তথ্যসূত্র :

১. ভাদুড়ী, সতীনাথ, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', করুণা প্রকাশনী, ২০১৯, পৃ. ৪
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'পদ্মা নদীর মাঝি', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৩৬, পৃ. ৯৩
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'পুতুল নাচের ইতিকথা', দে'জ পাবলিশার্স,২০১৭, পৃ. ১৫
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালি', দে'জ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৩৪

বানান অভিধান :

১. আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি